[পঞ্চাশ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা ছাত্র ছিলেন শাহ এ এম এস কিবরিয়া। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) পাস করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৩ সালে। উভয় পরীক্ষায়ই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৫৪ সিএসএস পরীক্ষায় সারা পাকিস্তানে প্রথম হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে গিয়েছিলেন। দেশে এবং বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন, আশির দশকের পুরো সময়টাই জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং এসকাপের নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯২ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার পর দলের সভানেত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

*গত ২৫ জানুয়ারি সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া এই লেখাটি সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ পত্রিকার জন্য লেখেন। পরের দিনই তার হবিগঞ্জ যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হবিগঞ্জের কর্মসূচি এক দিন পিছিয়ে যাওয়ায় ২৭ জানুয়ারি সকালে তিনি ঢাকা থেকে হবিগঞ্জ যান। তারপর সন্ধ্যায় ঘটে মর্মান্তিক গ্রেনেড হামলার ঘটনা। গুরুতর আহত জনাব কিবরিয়াকে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জনাব কিবরিয়ার এই শেষ লেখাটি আজ ২৯ জানুয়ারী **দৈনিক প্রথম আলোয়** ছাপা হয় । আজীবন মুক্ত-মন ও মুক্ত-চিন্তার অধিকারী জনাব কিবরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখাটি মুক্তমনায় ছাপা হলো।]*

বাজার অর্থনীতি ও দারিদ্র্য বিমোচন

শাহ এ এম এস কিবরিয়া

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বাবু ও বিবিদের নিয়ে বহু মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। বিলাসিতার মানে কে কত ওপরে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হতো। রবীন্দ্রনাথ এক গল্পে বাবুয়ানার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, 'জমিদার বাবুরা শান্তিপুরী ধুতির পাড় ছিঁড়িয়া পরিধান করিতেন।' কারণ ধুতির পাড়ে তাদের 'সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত।' জমিদারগিন্নিরা তাদের পোষা বিড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করাকে কোনো ব্যাপারই মনে করতেন না। ইংরাজরা এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিলো। অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত ও অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত। অবশ্য এই শ্রেণীর মধ্য থেকে শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান নগণ্য নয়। কিন্তু যে ধরনের শোষণের ওপর ভিত্তি করে এই বিলাসী সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ছিলো তা কেউ সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। বিলাসী জমিদার শ্রেণী আর নেই কিন্তু অন্য ধরনের বিলাসী শ্রেণী কি আমরা জন্ম দেইনি? বস্তুত বর্তমান বাংলাদেশে ধনী দরিদ্রে বৈষম্য অতীতের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্য ধনীদের সম্পদের উৎস হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য ও

শিল্প। অনেকে হয়তো বলবেন, চাঁদাবাজি ও চোরাচালানিকেও অনেক বিত্তবানের উৎস বিবেচনা করা উচিত।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতন্ত্রকে আজকাল আর ফ্যাশানেবল মনে করা হয় না। সবাই বলে বিশ্বায়নের কথা। অথচ সমাজতন্ত্রের মূল কথা সামাজিক ন্যায়বিচার। কমিউনিজমের বাংলা অনুবাদ সাম্যবাদ। সাম্য বা সমতা আনয়ন করাই কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থার সারকথা। সমাজতন্ত্রের সারমর্ম হচ্ছে উৎপাদনের ব্যবস্থার ওপর সমাজের মালিকানা থাকবে। মনে পড়ে স্কুলে নজরুলের সাম্যের গান কবিতা পাঠ করে কত উজ্জীবিত হয়েছিলাম। কিন্তু এসব আদর্শ যেন আজকাল তেমন উৎসাহ সৃষ্টি করে না। কিসের সাম্য? সকলের একই লক্ষ্য। টাকা বানাও, যতো পারো টাকা বানাও। যে কোনো উপায়ে, সৎ পথে হলে ভালো, অসৎ পথে হলেও আপত্তি নেই। অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের কাহিনী সমাজ কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে যায়। দ্বিতীয় প্রজন্মে কেউ এ নিয়ে চিন্তা করে না। বাংলাদেশে এ ধরনের মানসিকতা বেশ প্রবলভাবে বিরাজ করছে। সাম্যবাদ দূরে থাক, সামাজিক ন্যায়বিচারের কথাটাও কেউ মনে রাখে না।

অবশ্য সমাজতন্ত্রের কথা ফ্যাশানেবল না হলেও দারিদ্র্য মোচনের কথা আজকাল সবার মুখে। সবাই জানে এসব কথার কথা– কেউ এসব কথাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না। বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্র্য মোচনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি আইএমএফ পেছনে পড়ে রইবে কেনো? তারাও দারিদ্র্য দূরীকরণের বুলি আউড়াচ্ছে। অবশ্য এসব বুলির বিশ্বাসযোগ্যতা বড় কম। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় আইএমএফ যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো তা বিশ্ববাসী এখনো ভুলে যায়নি। নব্বইর দশকে এশিয়ান অর্থনৈতিক সংকটের সময় আইএমএফ-এর পরামর্শ শুনে থাইল্যান্ড, কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। এসব দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিলো। বিশ্বব্যাংক প্রায় তিন দশকের বেশি সময় যাবত আফ্রিকায় অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। ফল কি হয়েছে? আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ আজ দারিদ্র্যের নাগপাশে আবদ্ধ। আফ্রিকার দেশগুলোর দারিদ্র্য মোচনের আশা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে। এখন তারা দারিদ্র্য এবং এইডস রোগ– দুটোকেই একসঙ্গে মোকাবেলা করছে।

বাংলাদেশেও দারিদ্র্য মোচনের জন্য একটি দলিল তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতারা এই ডকুমেন্টের কথা শুনেছেন বলে মনে হয় না। বিশ্ব ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সরকারের কতিপয় আমলা মিলে এই কাগজটি তৈরি করেছে। আমি জানি না কিভাবে দারিদ্র্য দূর করার কৌশল নির্ধারিত হয়েছে। কারণ বিগত তিন বছর যাবত দেশে দারিদ্র্য বাড়ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়নি। তাদের হাতে খরচ করার মতো আয় (হবঃ ফরংঢ়ড়ংধনষব রহপড়সব) অপরিবর্তিত। কিন্তু দ্রব্যমূল্য, বিশেষত খাদ্যদ্রব্য মূল্যের পরিমাণ অন্তত ৫০ শতাংশ বেড়েছে। সুতরাং দারিদ্র্য মোচন নয়, তীব্রতর দারিদ্র্যের কবলে পড়ছে দেশের সিংহভাগ মানুষ। তবে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা খারাপ হলেও কতিপয় ব্যক্তি ফেঁপে-ফুলে বিশাল আকৃতি ধারণ করেছে। এদের অর্থের উৎস বৈধ এবং অবৈধ হতে পারে কিন্তু সমাজ তা জানবে কি করে? কিছুদিন পূর্বে কাগজে দেখলাম চট্টগ্রামের সাকা চৌধুরী তার পুত্রের

বিয়েতে লক্ষাধিক লোককে আপ্যায়িত করেছেন। কত টাকা খরচ হয়েছে? সাধারণ নিম্নবিত্ত পাঠকদের জন্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বর-কনের জন্য স্টেজ নির্মাণ করতেই নাকি ৪২ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। তাহলে সবসুদ্ধ কত ব্যয় হতে পারে তা হয়তো অনুমান করা যায়।

সাকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে চোরাচালানির অভিযোগ আছে। তার বিশাল সম্পদের পাহাড় বৈধ পথে অর্জিত হয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করে না। বৈধ পথে অর্জিত হলেই এভাবে ব্যয় করার যৌক্তিকতা কি? ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পড়হংঢ়রপঁড়ঁং পড়হংঁসঢ়ঃরড়হ অর্থাৎ দৃষ্টি কাড়ার মতো ভোগবিলাস। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে এ ধরনের ব্যয়ের পেছনে থাকে সাধারণ আমজনতাকে ইমপ্রেস করার আকাঙ্ক্ষা। হতভাগারা দেখুক আমি দুই লাখ লোকের মেজবানী খাওয়াতে পারি, যদিও দেশের বহু পরিবার দু বেলা খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। এটাও যেনো সেই বিড়ালের বিয়ের মতো। লোকের চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্য দেখানোর ইচ্ছা থেকেই এ ধরনের পড়হংঢ়রপঁড়ঁং পড়হংঁসঢ়ঃরড়হ করা হয়।

উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ প্রবৃদ্ধি না হলে দারিদ্র্য বিমোচন শক্ত হয়ে পড়ে। একটা স্থবির ও নিম্ন আয়ের সমাজে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয় না। তেমন একটা সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা চালু হয়েছিলো। এটা সম্ভব হয়েছিলো কারণ আমাদের সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিলো প্রায় ৬ শতাংশের মতো। রপ্তানি এবং শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং কৃষি উৎপাদন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ অর্থনীতি ছিলো গতিশীল (ফ্ু্হধসরপ) এবং এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। পরিবেশ অনুকূল ছিলো বলেই এ ধরনের প্রোগ্রাম শুরু করা সম্ভব হয়েছিলো।

বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের হাতেই অর্থনীতির চালিকাশক্তি ন্যস্ত থাকে। সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও মুনাফা- এই চক্রের আবর্তনেই অর্থনীতি এগিয়ে চলে। মুনাফা থেকেই বিনিয়োগ হয় এবং এর ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থায় একটি ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়। দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দারিদ্র্য বিমোচন হয় না। অর্থাৎ 'চুইয়ে পড়া' প্রক্রিয়া আংশিকভাবে দরিদ্র শ্রেণীকে উপকৃত করলেও সবাই এই সমৃদ্ধিতে অংশীদার হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হয়। নতুবা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও দারিদ্র্য দূর না হয়ে তীব্র হতে পারে। সমাজের একটা অংশ উন্নয়নের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। সাধারণত দেখা যায় সমাজের পশ্চাৎপদ অংশই উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে না, বয়োজ্যেষ্ঠ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে। ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় ভারসাম্য অনেক বেশি। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক বেশি সুগঠিত। সামাজিক অবকাঠামো রাষ্ট্রীয় সহায়তা লাভ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বাসস্থানের প্রশ্নে রাষ্ট্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। রাষ্ট্র বাজার অর্থনীতিকে সামাজিকভাবে একটা সহনীয় ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড ইত্যাদি স্কান্ডিনাভিয়ান দেশ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস করে। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য বেসরকারি

খাতেই পরিচালিত হয়। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে একটা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। ব্রিটেনেও থেচার যুগের পর বাজার অর্থনীতির প্রবল প্রতাপ। কিন্তু সেখানেও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা হচ্ছে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি ও স্পেনের বেলায় একইভাবে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ততো মজবুত নয়। যদিও সেখানেও বয়স্ক ও দরিদ্রদের জন্য মেডিকেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল। মার্কিন ধনতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু নিউইয়র্কের রাজপথের ফুটপাথে হাজার হাজার গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাস করতে দেখা যায়। বাজার ব্যবস্থার তীব্র প্রতিযোগিতায় এসব ব্যক্তি ব্যর্থ হয়ে ছিটকে পড়েছে। রাষ্ট্র বা সমাজ তাদের জন্য কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা করেনি।

প্রতিবেশী ভারতে আমরা দেখেছি নব্বইর দশকের শুরু থেকে উদারীকরণের পর উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিজেপি সরকার উদারীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার করেছে এবং বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুফল সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভোগ করেনি। সমৃদ্ধি উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমিত ছিলো। এই অবস্থার বিরুদ্ধে দরিদ্র ভোটারদের প্রতিবাদের ফলেই বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলে কংগ্রেস দরিদ্রদের আশ্বস্ত করতে পেরেছে। যদিও বর্তমান কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার উদারীকরণ ও বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে বিজেপির নীতিই অনুসরণ করছে। নব্বই দশকের গোড়াতে মনমোহন সিং-এর উদ্যোগেই ভারতের উদারীকরণ শুরু হয়েছিলো। অনেকটা ইউরোপীয় মডেলে কংগ্রেস সরকার উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণের দ্বৈত নীতি অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। জোট সরকার উন্নয়নের কথা মুখে বলে কিন্তু আসলে তারা অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান সুরক্ষা করার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে শুধু ব্যর্থ নয়, তারা আসলেই উদাসীন। সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। এর ফলে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেন্টার ফল পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর গবেষণা অনুসারে, 'মোদ্দা কথা, উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে আপনা থেকে দরিদ্ররা উপকৃত হয়নি।' (সিপিডির ২০০৩ সালের রিভিউ, পৃষ্ঠা-৬)। বস্তুত দেশে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের তীব্রতা বাড়ছে, কোটিপতিদের সংখ্যাও তেমনি বাড়ছে। এর ফলেই আমরা দেশে এক ধরনের বিলাসিতার প্রবণতা লক্ষ্য করছি। ঢাকা শহরে বিলাসবহুল 'শপিং মল' তৈরি হচ্ছে যেখানে মূলত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরাই কেনাকাটা করবে। অর্থ সম্পদ তাদের হাতেই পুঞ্জীভূত হয়ে যাচ্ছে, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষ– বিশেষত যাদের আয় পূর্ব নির্ধারিত, অর্থাৎ যারা মাসিক বেতনের ওপর বা সঞ্চয় থেকে অর্জিত সুদের ওপর নির্ভর করে সংসার চালান– তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এসব চাকচিক্যময় শপিং সেন্টারের বিলাসদ্রব্য ক্রয় করার সাধ্য এদের নেই।

বাংলাদেশের মানুষ বাজার অর্থনীতি মেনে নিয়েছে কিন্তু দেশে একটা কৃত্রিম ধনিক শ্রেণী তৈরি হোক এবং ধনী দরিদ্র্যের বৈষম্য বৃদ্ধি পাক– তা নিশ্চয়ই তারা চায় না। সমাজে একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সমাজ সচেতনতা ও সরকারি উদ্যোগ। লন্ডনে এবং বস্টনেও দেখেছি নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য স্থানীয় সরকারের পক্ষ থেকে ফ্ল্যাট তৈরি করে দেয়া হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এসব ফ্ল্যাটের ভাড়া নিম্ন আয়ের নাগরিকদের আয়ত্তের মধ্যে। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় যখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠী নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের সাহায্য করা হয়। মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। বাজার ব্যবস্থার ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে সমাজে শুধু বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে না, উদ্বেগ ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সুবিচারের নীতিমালাকেও অগ্রাধিকার দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই চলবে এবং দেশে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেসরকারি খাতই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু পাশাপাশি রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে সমাজের দুর্বল অংশকে উন্নয়নের বলয়ের ভেতরে নিয়ে আসার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশ স্মরণ করা যেতে পারে। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে– কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) সংবিধানের উপরোক্ত বিধানকে মনে রেখেই কাজ করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামীতেও এই দল এই মহান আদর্শ অনুসরণ করেই সরকার পরিচালনা করবে।